শহীদ কাদরীর কবিতা : উৎস ও দ্যোতনার উত্তরাধিকার

ফকির ইলিয়াস

একটি জাহাজ চলছে। সমুদ্রের নীল আভা ঘিরে রেখেছে জাহাজের পাটাতন। ক্যাপটেন বসে আছেন ডেকে। খুব দূরে তার চোখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সদা সতকর্তার হুইসেল শুনে শুনে ক্যাপ্টেন পার হচ্ছেন জোসনা সাগর। কিংবা একজন সামরিক ক্যাপ্টেন এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তার বাহিনী। তার বুট স্পর্শ করছে মৃত্তিকার সবটুকু সবুজ। শিশিরে ভেজা বুলেটের খোসা কুড়াতে কুড়াতে তিনি একাধিক ফাগুনকে দাঁড় করাচ্ছেন তার মুখোমুখি।

তিনি কবি শহীদ কাদরী। বাংলা কবিতার একজন ক্যাপ্টেন। একজন অধিকর্তা। নিয়ন্ত্রক। প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অতন্দ্র প্রহরী। উত্তরাধিকারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। কবি শহীদ কাদরীর মুখছবি মানসপটে ভেসে উঠলেই আমরা শান্তির একঝাঁক পায়রাকে আমাদের আকাশ জুড়ে উড়ে যেতে দেখি। তার কবিতায় প্রবেশ করলেই আমরা মনের অজান্তে বলে উঠি, 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা।'

সংকটের চিরায়ত কম্পন একজন মানুষের জীবনকে কি দিতে পারে পরিপূর্ণ উপলব্ধি? কিংবা 'প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে' দাঁড়িয়ে কোনো যোদ্ধা কি এঁকে যেতে পারে তার কাঙ্খিত প্রিয় মুখ? এমন অনেক প্রশ্নের জবাবই আমরা পেয়ে যাই তার কবিতায়। ১৯৪২ সালের ১৪ আগস্ট জন্ম নেয়া এই কবির জীবনবোধ যেন হয়ে যায় তার চার-পাঁচ দশক অনুজপ্রতিম কোন কবির জীবন মধ্যাহ্ন।

শহীদ কাদরীর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। 'উত্তরাধিকার' (১৯৬৭), 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' (১৯৭৪) এবং 'কোথাও কোন ক্রন্দন নেই' (১৯৭৮)। মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থের জনক এই কবির, জনপ্রিয়তা কেন এতো বেশী? –এ প্রশ্নটি আসতেই পারে বিভিন্ন কারণে। কিন্তু একথা স্বীকার করে নিতেই হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত আলোকরশ্মি বিতরণের যে সব রসদ কবিতায় থাকা দরকার, তার সবই আছে তার কবিতায়। আর সে জন্যেই বোধ হয় শূন্য শতকের কোন পাঠক-পাঠিকা এখনও খোঁজ নিতে তৎপর হন, শহীদ কাদরী কোথায় আছেন– কেমন আছেন। না আমি তাঁকে নাগরিক কবি বলতে রাজি নই।

তাঁর উক্তি আমাদেরকে সম্মিলিত স্পর্শের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে জানান দিয়ে যায়, তিনি পরিশুদ্ধ মানবগোষ্ঠীর কবি।

'আমরাই বিকৃত তবে? শান্ত, শুদ্ধ এই পরিবেশে
আতর লোবান আর আগরবাতির অতিমর্ত্য গন্ধময়
দেবতার স্পর্শ-পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের উচ্চারণে
প্রতিধ্বনিময় শব্জীক্ষেতের উদার পরিবেশে'

[নপুংসক সন্তের উক্তি/উত্তরাধিকার]

দুই.

শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় যে দ্রোহের দ্যোতনা দেখিয়েছেন, তা আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়েছে বৈষম্যের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পরিশুদ্ধ মানবসমাজ গঠনের কথা। তাঁর সমকাল, তাঁর বিবর্তনচিত্র এমন

কিছু ব্যঞ্জনার ছায়াপাত ঘটিয়ে গেছে– যা পাঠক-পাঠিকাকে শুধু ভাবিয়েই তুলে না, নতুন করে জীবনান্বেষণের দরোজা খুলে দেয়।

‘রক্তপাতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় চঞ্চল কৈশোর-কাল
শেখানে মারণ-মন্ত্র, আমার প্রথম পাঠ কি করে যে ভুলি
গোলাপ-বাগান জুড়ে রক্তে-মাংসে পচেছিল একটি রাঙা বৌ
ক’খানা ছকের ঘুঁটি মানুষের কথামতো মেতেছিলো বলে।’
[উত্তরাধিকার/উত্তরাধিকার]

এভাবে নিতান্ত নিজস্ব কাঁচ তৈরি করে সেখানেই কবি খুঁজেছেন জীবনের সঙ্গতি। যে জীবন সজাগ দৃষ্টি নিয়ে কেবলই তাকিয়ে থাকে, স্থির, আমাদের দিকে।

আবার আমরা এটাও দেখি, এই দ্রোহী কবি একান্তভাবেই নতজানু হয়ে যান তার কবিতার কাছে। প্রেমের ছায়াপর্দায় বর্ণের ঝলক দেখে দেখে পরিপুষ্ট মননের নদী তৈরি করে যান তাঁর উত্তরসুরীদের জন্য।

‘দেয়ালে ছায়ার নাচ,
সোনালী মাছের। ফিরে দাঁড়ালাম সেই
গাঢ়, লাল মেঝেয়, ভয়-পাওয়া রাত্রিগুলোয়
যেখানে অসতর্ক স্পর্শে গড়িয়ে পড়লো কাঁচের
সচ্ছল আধার, আর সহোদরার কান্নাকে চিরে
শূন্যে, কয়েকটা বর্ণের ঝলক
নিঃশব্দে ফিকে হল; আমি ফিরে দাঁড়ালাম সেই
মুহূর্তটির ওপর, সেই ঠান্ডা করুণ মরা মেঝেয়।’

[স্মৃতি : কৈশোরিক/ উত্তরাধিকার]

তিন.

শহীদ কাদরী তাঁর ’নিসর্গের নুন’ কবিতাটি যখন লিখেন তখন কেমন ছিল আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক চিত্র? যারা তা দেখি নাই, তাদের কাছে হয়তো তা এখনো থেকে যেতে পারে অনেকটা আবছা। কিন্তু সে চিত্রটি এখন কেমন? তার একটা তুলনামূলক চিত্র আমরা পেতেই পারি খুব সহজে।

‘আমিও সশব্দে নিসর্গের কড়া নেড়ে দেখেছিলাম
পুকুর পাড়ের ঝোপে চুপিচুপি
ডাকাত-পড়ার ভয়ে স্পন্দমান নিঃশ্বসিত জল
কুলুপ লাগালো তার নড়বড়ে নষ্ট জানালায়’
[নিসর্গের নুন/উত্তরাধিকার]
একই কবিতায় কবি সযত্নে তুলে এনেছেন সেই নির্বাসন প্রসঙ্গ।
‘ন্যুইয়র্কে নির্বাসনে যদিও অমিয় চক্রবর্তী তবুও তো পেয়েছেন
কবিতার উজ্জ্বল ডালপালা
আর ক্ষিপ্ত মিসিসিপির গাজনে যমুনার উচ্ছল ভজন
ভল্‌গা-গঙ্গার ধারে ধারে

হে নিসর্গ, হে প্রকৃতি, হে সুচিত্রা মিত্র
হে লঙ-প্লেয়িং রেকর্ডের গান
হে বিব্রত বুড়ো-আংলা, তুমি গীত-বিতান আমার!'

কাকতালীয়ভাবে শহীদ কাদরীও আজ নির্বাসিত। এবং এই নিউইয়র্কেই। যেখানে বসে অমিয় চক্রবর্তীও লিখেছিলেন তার কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কী স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শহীদ কাদরী? কোন অভিমান, কোন শংকা, কোন টান তাড়া করে প্রতিনিয়ত তাকে? তাঁর 'অগ্রজের উত্তর' কবিতায় আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছিলাম সর্বদা রক্তনেত্র একজন কবি একরাশ চুলের বদলে উড়িয়েছেন শোকের পতাকা।

'না, না, তার কথা আর নয়, সেই

বেরিয়েছে সকাল বেলায়, সে তো-শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।'

[অগ্রজের উত্তর/উত্তরাধিকার]

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যখন প্রকাশ পায় তখন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির বয়স প্রায় চার বছর। এই গ্রন্থে আমরা তার কাব্যবুনন লক্ষ্য করি ভিন্ন আঙ্গিকে। রাষ্ট্র মানে কি, এর একটি চিত্র তিনি দিয়েছেন শুরুর কবিতাটিতেই।

'রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের

সাঁজোয়া বাহিনী

... ...

রাষ্ট্র মানেই স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে
এনগেজমেন্ট বাতিল
রাষ্ট্র-মানেই পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত
ব্যর্থ সেমিনার
রাষ্ট্র মানেই নিহত সৈনিকের স্ত্রী
রাষ্ট্র মানেই ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া
রাষ্ট্র মানেই রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা
রাষ্ট্র-সংঘের ব্যর্থতা মানেই
লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট–!'

[রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট/ তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]

প্রেমের উষ্ণতা কবির পাঁজরকে দিয়ে যায় গল্পের সাজানো প্লট। তখন শ্রাবণের দেয়ালেও কবির হাতে লেখা হয়ে যায় অমর পংক্তিমালা। আমরা, পাঠক-পাঠিকারা পড়ে যাই– সেই নিঃশব্দ পোস্টার।

'শাদা রাস্তা চলে গেছে বুকের মধ্যে

পাতার সবুজ সম্মিলিত কাঁচা শব্দে
যে তোমাকে ডেকেছিলো 'রাধা'
আধখানা তার ভাঙাগলা, আধখানা তার সাধা।'

[বৈষ্ণব/তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]

মানুষের চৈতন্য প্রবাহকে সর্বদা শাণিত করে যাওয়াই কবির কাজ। এমন অনবদ্য চেতনাচিত্ত আমরা তাঁর অনেক কবিতাতেই পাই। আত্মমগ্নতার অভিঘাত ধারণ করে সব চলমানতাই হয়ে উঠে আমাদের প্রতিবেশী। যদিও কবি বলেন 'কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার'– কিন্তু আমরা কবিতাকে পেয়ে যাই ভোরের সূর্যের মতোই।

'আর আমাকে ফিরিয়ে দিলে
মধ্যরাত পেরুনো মেঘলোকে ডোবা সকল রেস্তোরাঁ
স্বাধীনতা, তোমার জরায়ু থেকে
জন্ম নিলো নিঃসঙ্গ পার্কের বেঞ্চি
দুপুরের জনকল্লোল
আর যখন তখন এক চক্কর ঘুরে আসার
ব্যক্তিগত, ব্যথিত শরে, স্বাধীনতা!'

[স্বাধীনতার শহর/ তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা]

চার.

তাঁর বেশ কিছু কবিতা আছে, যা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। 'রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন?' 'নির্বাণ', 'গোধূলি', 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা', 'কেন যেতে চাই', 'প্রেম', 'সঙ্গতি', 'একটি মরা শালিক', 'কেন যেন বলছে', 'আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম', 'উত্থান', 'বালকেরা শুধু জানে,' 'একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল', 'দাঁড়াও আমি আসছি', প্রভৃতি কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

তিনি মানবসত্তার দ্রোহ এবং উত্থানকে চিত্রিত করেছেন তাঁর নিজের মতোই। আর এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে আছে দশকের পর দশক। এবং থেকে যাবেও অনন্তকাল।

'পাথর তোমার ভেতরেও উদ্বৃত্ত
রয়েছে আর এক নৃত্য।'

[নর্তক/কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই]

মাত্র দু'লাইনের একটি কবিতা। কিন্তু কী গভীর আখ্যানে তিনি সেরেছেন তার নিজস্ব চিহ্নায়ন। তাঁর দূরদর্শিতা বার বারই একই প্লাটফর্মে এনেছে আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত, শান্তির স্বপক্ষে।

তিনি লিখছেন এখনও। তবে সে সংখ্যা খুবই কম। তাঁর পাঠকরা এখনো উদগ্রীব থাকেন নতুন কী লিখলেন কবি। তাঁর সর্বশেষ লেখা দুটি কবিতা পড়েছি 'মাসিক কালি ও কলম'-এ। শান্তি ও মানবতার পক্ষে তিনি এখনো যে কতো বলীয়ান, তা তার পংক্তিগুলো পড়লে সহজেই বুঝা যায়।

'এই গ্রহের মহাপুরুষরা কে কী বলেছেন
আপনারা সবই জানেন। এখানে বক্তৃতা আমার উদ্দেশ্য
নয়। আমি এক নগণ্য মানুষ, আমি
শুধু বলি : জলে প'ড়ে যাওয়া ঐ পিঁপড়েটাকে ডাঙায় তুলে দিন।'

[আপনারা জানেন/ কালি ও কলম, মে ২০০৮]

শহীদ কাদরী এভাবেই এই উত্তর প্রজন্মকে দিয়ে যাচ্ছেন অনেকগুলো আশার শিউলি সকাল। মসৃণ গোলাপ আর তেজী সাহস দুটোই তিনি তুলে দিচ্ছেন মানুষের হাতে। এবং জোর গলায় বলছেন ভালোবাসাই দখল করে নেবে এই বিশ্বের সকল বেদনাকে।

'আমি জানালা থেকে দেখলাম
মনজুর এলাহীর গোটা বাগান
জোনাকিরা দখল করে নিয়েছে-
বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে।'

[বিপ্লব/কালি ও কলম, মে ২০০৮]

তাঁর কবিতা আমি যতোই পড়েছি, ততোই মনে হয়েছে প্রতিটি কবিতা নিয়েই লেখা যেতে পারে একেকটি নিবন্ধ। তিনি যা কয়েক দশক আগে লিখেছেন তা যেন আমাদেরই প্রাত্যহিক অস্তিত্বের আঁচড়।

'হাওয়ায়-হাওয়ায় অনেক উড়লে
গাছের সঙ্গে একটা দিন
না হয় কিছু জমলো ঋণ।'
[একটা দিন/ কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই]

হ্যাঁ, বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতা- আর পাঠক-পাঠিকারা তাঁর কাছে খুবই ঋণী। এ ঋণ কোনোদিনই শোধ হবার নয়। তিনি বলেছেন 'চাই দীর্ঘ পরমায়ু।' আপনার সত্তা বাংলা কবিতারও পরমায়ু, প্রিয় কবি।

নিউইয়র্ক।